# পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

## বিষ্ণু দে, সহলিপি- ভাবনা ও ধারণালব্ধ কবিতা

'সহলিপি' বলে এক ধরনের লিপির কথা বলা হয়েছিলো 'পরিবিষয়ী কবিতা'র শ্বেতপত্রে। শরীরের সাথে লেগে থাকা ছায়ার মতো মূল কাব্যলিপির এক সংযুক্তলিপি হিসেবে ভাবা হয়েছিলো সহলিপিকে। 'সহলিপি'র মূল ভাবনার কথা প্রথম তোলে সব্যসাচী সান্যাল। আনুমানিক ২০০৭-২০০৮ সাল নাগাদ। পরের দু-তিন বছরে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভাবনাটাকে বিস্তৃত করতে শুরু করে। আমিও এই কর্মকান্ডে যোগ দিই। এখানে যাকে 'সহলিপি' বলছি তাকে আরো অনেক নাম দেওয়া হয় - সব্যসাচী বলে 'পার্শ্বলিপি', শান্তনু 'আন্তর্লিপি', ও 'মাধুকরী লিপি', আমি 'সাধনলিপি', 'অনুজালিপি' ইত্যাদি। ২০১১ সালে যখন পরিবিষয়ী কবিতার শ্বেতপত্র লেখা হচ্ছে সেসময় 'সহলিপি' শব্দটা আসে। কিছুটা যৌথভাবেই।

এসময়ের কিছু কবির লেখালিখির পাশাপাশি গড়ে উঠছিলো এক ধরনের গৌণ লেখা, যা সবসময় যে লেখা, এমনও না। আবার লেখা হলেও সে লেখা যে সবসময় ছাপা হচ্ছে, এমনও না। অনেক সময়েই তা অপ্রকাশিত, অদৃশ্য। শুধু এইসময় নয়, আমার ধারণা অতীতের অনেক কবিই এমন অনেক লিপির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। রচনাও করেছেন। কিন্তু বাড়ি রঙ বা মেরামত করা হয়ে গেলে যেমন বাঁশের ভারা খুলে নেওয়া হয়, যেমন রান্না শেষে সব কুটনো ফেলে দেওয়া হয়, ছাঁচ সরিয়ে নেওয়া হয়, তেমনিই এই সব সহলিপিকে সরিয়ে ফেলা হতো। আজ আমাদের মনে হচ্ছে সহলিপির অস্তিত্ব ঘোষণা জরুরী। সহধর্মিনীর সাংসারিক কাজকে যেমন সম্পূর্ণ চাকরি হিসেবে ধরা হচ্ছে, মূল্যায়ন করা হচ্ছে, সহলিপির গুরুত্ব ঠিক ততোটাই। এবং অনেক সময়েই দেখা যাচ্ছে সহলিপির গুণমান এমন সাঙ্ঘাতিক অগ্রণী ও কালোত্তীর্ণ যে সেটা নতুন সৃষ্টির আকারে মূলকে ম্লান করে দিচ্ছে।

সহলিপির সংজ্ঞা ও তার পোটেন্সি নিয়ে ভাবতে ভাবতে একটা কবিতা গড়ে উঠতে থাকলো। বহুমাস সেভাবে কবিতা লিখিনি, তাই নতুন লেখার রোমাঞ্চে একটু চঞ্চল হলাম। লিখছিলাম -

নিখোঁজ অবলম্বনেই সব
নিরুদ্দিষ্টই চাকতির কেন্দ্রে সেই ছোট বৃত্ত
যাকে তাক করে তীরের মনন আর তীরন্দাজের মন

সব কবিতাই এক হারানোর কথা
এহুদি বলেছিলেন, কবিতায় আসে
ফুলের স্পর্শের বদলে তার নামধ্বনি
মুখ ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মুখোশ
এক পেশীবহুল অস্তিত্বময় যে কিনা চলমান অশরীরী

সে মঞ্চের মূল আলোর শঙ্কুর মধ্যে এসে দাঁড়ায় যখন
আমরা ভুলে যাই
হেমন্তগানের ধারক যে শুধু উত্তম ওষ্ঠ নয়

আরো অনেক কিছু  শরীরী ও অশরীরী
অভিনয়ও গান
ভঙ্গিমা ও অনুভূতির ইঙ্গিত
কে যে কার প্লেব্যাক
কার যে স্বর
কোলে বসানো মাইকেল
না ভেন্ট্রিলোকুইস্টের!

যে দস্তানা পরে আছি তাতে কি আর কারো হাত ছিলো?
বিষ্ণু লিখেছেন –
*এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল*

সবটা না থাকা হয়তো নিজের অর্ধেকটা হারানো
হয়তো এহুদিই ঠিক
যেমন গাজার কজন হিব্রু বোঝেনা, কতজন আরবি
তার সমীক্ষা নিয়ে রকেট ও বোমার তো কোনো মাথাব্যথা নেই
সত্তা না বিবেক না মানবতা
কে আজ ফেরারী  কেন ফেরারী
এ প্রশ্ন যে কণ্ঠে  সেই স্বরও অনুরণিত কিনা?

অনুরণন মূলকে কতোটা বদলায়
পরিভাষা ও উদ্দেশ্য?
সেই সঙ্গমরতাকে মনে পড়ছে যে হাসতে হাসতে
আদুরে গলায় বলছিলো –
মানবতা আমাদের কোমরের উর্ধাংশে
আর নিম্নার্ধে জান্তবতা
(আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

গতকাল (জুলাই ১৮, ২০১৪) রাতে একটা কবিতা পড়তে পড়তে এই লেখা এসে যায়। হঠাৎই। সে লেখার প্রভাবে এই নির্মীয়মান, এমনটা বলতে পারবো না। বরং বলবো সেই লেখার প্রতিক্রিয়ায় বা সমান্তরালে এটা শুরু হয়। সেই মূল কবিতা একদিকে আমার ভাবনাকে চালিত করে, তাকে ইন্ধন দেয়, এমনকি তার জন্য প্রথম কয়েক মাইলের ব্রডগেজও পেতে দেয়। বাকিটা নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়, হচ্ছে। সেই মূল কবিতার রচয়িতা বিষ্ণু দে। কবিতার নাম ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’। কিন্তু ‘মূল’ কবিতা? কার ‘মূল’? কোথাকার ‘মূল’। দেখা যাক বিষ্ণু কী লিখছেন –

‘রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেনঃ
সকলই প্রস্তুত, মেরাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,
ভিয়েনে আগুন জ্বলে, দেউড়িতে সানাই
বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুরে সুরে,
ভাঁড়ারে বোঝাই ভোজ্য, যৌতুক বিস্তর,
আত্মীয়া পড়শী সব মুখর অস্থির,
বহু শিশু খেলে ঘোরে, নিশ্চয় পাত্রীর বুক দুরু দুরু
আবেগে আগ্রহে, বিবাহের সকলই প্রস্তুত।

এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, সভায় জমাট,
শাঁখ প্রায় বাজে বাজে, হুলুধ্বনি
এয়োদের পানরাঙা মুখে মুখে সমুদ্যত,
শুধু বর নেই –

রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত-
বিবাহের সকলই প্রস্তুত,
এমনকি বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নয়,
ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর, গণ্যমান্য অথবা নগণ্য,
ভিখারীও নানান রকম, কেউ বাবু, কেউ বা সাহেব,
আত্মার দুয়ারে, মনের রাস্তায়
সমাজের আস্তাকুঁড়-সাফাই লরিতে সত্তার ভিখারী,
দুস্থ, তবে বস্তীবাসী নয়, গদীয়ান আড়তে দপ্তরে,
দেহে মনে প্রাণে দুস্থ, হয়তোবা অর্থে নয়, ক্ষমতায় নয় –
বরযাত্রী নানান রকম, শুধু বর নেই।

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
...
...

এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল
ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে।
দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে'

(বিষ্ণু দে)

এক সাহিত্য আলোচনার আঙরাখায় এই কবিতাংশ। রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্প। কাহিনীর সেই অংশ যেখানে বিয়েবাড়ি প্রস্তুত, বরযাত্রী এসে গেছে কিন্তু বিনা বর। বর সেই যাকে আমি 'নিখোঁজ' বলে শুরু করলাম আমার ২০১৪-র কবিতাংশ। আর বিষ্ণু দে ১৯৬০-এর গোড়ায় সেই বরকেই বলছেন – 'সত্তা' – এমন এক সত্তা, যে 'খুঁজে ফেরে আত্মপরিচয়'; যে 'এক উপমা বহুমুখ'; শুধু তাই নয় আস্তরিত এক সংজ্ঞা – 'স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল'। কতো অগ্রণী, অগ্রসর ছিলো বাংলা কবিতা! আমি চমকে উঠি। গায়ের রোমকূপ দাঁড়ায়। কী প্রকান্ড, উদাত্ত, সময় টপকানো এক ধ্রুপদী কবিতা 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'! বিষ্ণু দে-র জন্ম শতবর্ষে বাংলাভাষার সম্পূর্ণ উল্টোপৃষ্ঠায় বসে ভাবি। বাংলা কবিতা কি সত্যিই এগিয়েছ? না অনবরত পিছিয়ে গেছে? ফিফা র‍্যাঙ্কিঙে ভারতীয় ফুটবলের মতো।

এইই তো সহলিপি। এক উত্তরলিপি। উত্তরাধুনিকরা দেখতে পাচ্ছেন *এ উপমার বহুমুখকে*? Textual layering কোথায় হচ্ছে, কীভাবে শুরু ও শেষ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন? আর 'ধারণালব্ধ কবিতা'? সে প্রসঙ্গে একটু ধীরে আসি। প্রথমে আবার ফিরে যাই 'সহলিপি'র ভাবনায়। কী সহলিপি?

সহলিপি এক লাগোয়া। শরীরের সাথে ছায়া একটু আগে লিখলাম। শোলের 'ইয়ে দোস্তি' গানের মোটর সাইকেলটাকে মনে পড়ে? যেটা ধর্মেন্দ্র চালাচ্ছেন আর তার গায়ে লাগা ক্যারেজ-কারটা? যেখানে বসে পা-তোলা অমিতাভ। সহলিপি ওইরকমই - এক সংযুক্তলিপি। এক ধরনের গৌণ লেখা। সবসময় যে লেখা হয় এই লিপি, তাও না। লিখলেও যে ছাপা হয় এমন নয়। এক অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, ভুতুড়েলিপি। কেউ কেউ লোভে পড়ে বলবেন – অদ্ভুতলিপি। শুধু এই সময়ে নয়, আমার ধারণা অতীতের অনেক কবিই এমন কিছু লিপির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। রচনাও হয়তো করেছেন।

কী হতে পারে সহলিপি?

সহলিপি কী বলার আগে সেটা কী নয় বলে নেওয়া যাক। সহলিপি প্রেরণাসূত্র নয়। কবিতালোচনাও নয়। একটা কবিতা বা শিল্পবস্তুর প্রভাবে লেখা আরেকটা রচনা নয়। সহলিপি বুকরিভিউ বা সরাসরি এক কবিতালোচনাও নয়। এক সিরিজ কবিতার আর একটা কবিতা নয়। সহলিপি একটা কবিতা বা শিল্পবস্তুর প্রভাবে লেখা আরেকটা রচনা নয়। সাধারণত রিমেক, রিমিক্সও নয়।

সহলিপিকে ইংরেজিতে আমরা আপাতত co-text (sub-text নয়) বলি। সহলিপি আমার মতে তিন রকমের –

ক) প্রাকলিপি বা pre-Text
খ) সমলিপি বা সমান্তরাল লিপি বা para-Text
গ) উত্তরলিপি বা পশ্চাতলিপি বা post-Text/after-Text।

প্রাকলিপি প্রস্তুতিপর্বের লেখালিখি, নোটস প্রভৃতি, এক প্রাক-উৎপাদনী (pre-production) কর্মকান্ড। অন্যলেখা বা অন্যশিল্প থেকে প্রস্তুত নোটস হতে পারে। অন্যলেখাকে কাটাছেঁড়া করে প্রস্তুত আস্তরলিপি বা layered text হতে পারে। প্রাকলিপির কিছুটা মূল লেখায় ব্যবহৃত হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। হয়তো গোটা প্রাকলিপিটাকেই বর্জন করা হয়েছে। বা মূলে এত বদলে গেছে যে চেনা যায় কম। প্রাকলিপি হতে পারে কোনো ছক, কোনো *ভাবনা-/স্কিমা* বা কোনো হাত-স্কেচ যা কবিতাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। প্রাকলিপিকে লিপি হতে হবে তার মানে নেই। গান, নাটক, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য – সমস্ত শিল্পের সাথে লেখার বেড়া এখানে খোলা থাকলো। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রাকলিপি অনুপ্রেরণা সূত্র নয়। ফরাসী কবি ক্লদ রোয়ে-জুর্নো অদ্ভুতভাবে কবিতা লেখেন। উনি আগে বড় গদ্য লেখেন, তারপর সেখান থেকে ছেঁকে নেন কবিতা। গদ্যটা ফেলে দেন। সেই গদ্য এক আদর্শ প্রাকলিপি।

সমলিপি বা para-text মূল লিপির সাহায্যের সমান্তরালভাবে গড়ে ওঠে। কখনো একটা কবিতা লিখতে গিয়ে অন্যলেখা হয়ে যায়। কবিতা লিখতে গিয়ে গদ্য বা প্রবন্ধ, বা উল্টোটা। দিনলিপি লিখতে গিয়ে হয়তো দেখা গেলো একটা উপন্যাসের জন্ম হচ্ছে। সেখানে

দিনলিপিটা সমলিপি। সমলিপিও যে সবসময় প্রকাশিত হবে তার কোনো মানে নেই। এবং সে ক্ষেত্রে সমলিপি আর প্রাকলিপিতে গোলমালও হয়ে যেতে পারে। এসব লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। সবকিছুতেই রবি। তাকে বাদ দিয়ে কিছু নেই। কেননা অতো বড়ো আকারের পরীক্ষাকবি-শিল্পী বাংলা কবিতা ভাষায় আর কে! সবকিছুই নিজের মতো করে নেন। সবকিছুতেই একটা নতুন শুরু- তাঁর। কবিতা সংশোধন করতে করতে রবি যে 'পরিশোধনশিল্প' (doodle-art) গড়লেন সেও তো এক সমলিপি। রবীন্দ্রনাথ বলেই যা ছেপেছিলেন, আজও ছাপা হয়। না হলে অবগুণ্ঠনেই থেকে যেত। এবার অধুনায়। শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক বই –সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কারপ্রাপ্ত - 'বৌদ্ধ লেখমালা ও অন্যান্য শ্রমণ' – সেখানে বৌদ্ধ শ্রমণদের জীবন, দর্শন, সমাজভাবনা সংক্রান্ত নানা লিপির সংগঠিত পাঠ কবিতার বইয়ের মেজাজ ও চরিত্রকে গড়ে তুলেছে। অথচ সেই 'সমলিপি' 'বৌদ্ধ লেখমালা...'র মধ্যে কোথাও শারীরিকভাবে নেই। 'প্রভাব'-এর সাথে 'সহলিপি'র একটা জোরালো তফাৎ আছে। 'প্রভাব' জিনিসটা অনেক সময়েই ইচ্ছাকৃতভাবে লুকিয়ে রাখা হয়, বা কবি সম্পূর্ণ বা কিছুটা অসচেতন থাকেন সে সম্বন্ধে। 'সহলিপি' গড়ে ওঠে এক পরিকল্পিত, সংগঠিত প্রয়াসে। সমলিপি হতে পারে কবিতার নানা সমান্তরাল ভার্সান, বাদ পড়া অংশ। বাইরে থেকে পূর্বনির্মিত লেখা, যা হয়তো কবিতার মধ্যে নিয়ে এসে তাকে install করা হচ্ছে, তাও সমলিপি। আমার দ্বিতীয় বই 'হাওয়ামোরগের মন'-এর অনেকটাই সমলিপি আসলে। আলাদা আলাদাভাবে লেখা বিচ্ছিন্ন পঙক্তি থেকে কিছু বেছে নিয়ে, কিছু ফেলে দিয়ে, অ্যাসেম্বল করে এক সমূহ চতুর্দশপদী। সমলিপির মধ্যে মূল কবিতার পংক্তি থাকতে পারে, আবার বাদ পড়া অংশও। ফিল্মের ক্ষেত্রে কেউ কেউ এমন করেছেন, সম্পাদকের টেবিল থেকে বাদ পড়া অংশগুলো তুলে নিয়ে একটা নতুন স্বল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি করেছেন। ফিল্মে সমলিপির অভিনব উদাহরণ প্রচুর। আজকাল তো সকলেই 'মেকিং অফ দ্য ফিল্ম' করেন। এমনকি মূল ছবির মধ্যেও এই 'মেকিং'কে রাখা হয়। এর একটা সাম্প্রতিক উদাহরণ স্পেনীয় ছবি 'Even the Rain' (También la Lluvia) যা ২০১১ সালে বার্লিনে পুরস্কৃত হয় – যে ছবির সাথে 'আকালের সন্ধানে'র একটা চরিত্রগত মিল রয়েছে। গানের জগতে সমলিপির উদাহরণও অনেক। একটার কথা এখানে লিখছি। খুব সামান্য ভারতীয় বাংলা ছবিতে সুর দিয়েছিলেন বীরেশ্বর সরকার। কিন্তু ওঁর সেইসব সুর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। এমনই একটা ছবি উত্তম-অপর্ণা অভিনীত 'সোনার খাঁচা' (১৯৭৩)। এই ছবিতে অনেক হিট গান ছিলো হেমন্ত ও লতার গলায়। কিন্তু আরো কিছু লুকোনো গান ছিলো। ছবির স্কোরিং শুনলে ধরা পড়বে, অনেক মুহূর্তের 'আন্ডারস্কোর' ১৯৭৯ সালের 'মাদার' ছবিতে হিট গানে পূর্ণাঙ্গরূপ নেয়। যেমন 'হতাম যদি তোতা পাখি', 'হাজার তারার আলোয় ভরা/ চোখের তারা তুই' ইত্যাদি। সলিল চৌধুরী ও শচীন ও রাহুল দেব বর্মণের সুরের মধ্যে এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে যেখানে একটা ছবির সুর করাকালীন অন্য ছবির কিছু সুর বা গান তৈরি হয়েছে। হয়তো আজকের অনুপম রায়ের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। এগুলো নিশ্চিত সমলিপি।

উত্তরলিপি গড়ে ওঠে উত্তর-উৎপাদনী (post-production) কর্মকান্ড হিসেবে। একটা লেখা নিয়ে সৃষ্টিশীল আলোচনা করতে গিয়ে গড়ে উঠতে পারে এই উত্তরলিপি। যতরকমের সৃষ্টিধর্মী উত্তর-উৎপাদন হয় তার প্রায় সবই উত্তরলিপির আওতায় পড়বে। শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ২০০৬ সালেই কবিসম্মেলন পত্রিকায় আমার বই 'হাওয়ামোরগের মন' নিয়ে একটা অদ্ভুত

পুস্তকালোচনা লেখে – 'আর্যনীল মুখোপাধ্যায়ের বই 'হাওয়ামোরগের মন' পড়ে'। সে রচনা ছিলো মৌলিক, সৃষ্টিশীল গদ্য। পুস্তকালোচনায় পুস্তকের নাম বা কবিরা নামোল্লেখ পর্যন্ত ছিলো না (শীর্ষক ছাড়া), এমনকি কবিতার কোনো পঙক্তির উদ্ধৃতিও নয়। পরে রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চোখ' বইটা নিয়ে শান্তনু একইরকম লেখা প্রকাশ করে। এগুলো উত্তরলিপির আদর্শ নমুনা। ২০০৮ সালের গ্রীষ্মে সব্যসাচী সান্যাল ইউরোপে নানা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। আর পড়ছিলেন শংকর লাহিড়ীর কাব্যগ্রন্থ 'মুখার্জি কুসুম'। সেই বইয়ের পাঠভাবনার সাথে সাংস্কৃতিক ভ্রামণিকা, পূর্ব ও পশ্চিমের দর্শন, বিলিতি টিভি কমিক, নানা বৈজ্ঞানিক ভাবনা ও অনুষঙ্গ বুনে তৈরি হয় ওর দীর্ঘকবিতা 'এপ্রিলতা', যা পরে বই হয়ে বেরোয়। এদিক থেকে দেখলে 'এপ্রিলতা' এক সম্পূর্ণ উত্তরলিপি। কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণও আছে। যেমন গাস ফান সান্ট নামে এক মার্কিন পরিচালকের কাজ। উনি হিচককের 'সাইকো' ছবির একটা হুবহু রিমেক করেন। কিন্তু একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যেহেতু হুবহু রিমেক প্রযোজক পেতে অসুবিধে হয়না। গাস সান্ট কিন্তু ছবিটা করে এইটা দেখাতে চেয়েছিলেন যে হুবহু নকল করতে চাইলেও ঠিক তা করা যায়না। কোথায় যেন ছবি, নানা কারণে, আলাদা হয়ে যায়। দৃশ্য-দৃশ্য, শট-শট মেলে না। এই ছবিকে উত্তরলিপি বলা যায়। জর্জ অপেন তার বিখ্যাত কবিতা 'অগণিত সত্তার' (Of Being Numerous) যখন লেখেন, বয়সে অনেক ছোট ফরাসী কবি ইভ বনফোয়ার কিছু কবিতাংশ সরাসরি নিজের কবিতার মধ্যে বক্রাক্ষরে অনুস্থাপন (install) করেন শুধু নয়, সেখান থেকে মোড় ঘুরতে শুরু করে আগের ছত্রের চিন্তাধারা। একইসঙ্গে সেই কবিতায় অন্যান্য দার্শনিকদের ভাবনারও ব্যবহার ছিলো, পরে সেই ভাবনার অনুসিদ্ধান্তিক (corollary) বর্ধন।

'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর যে অংশ তুলে দিলাম তা রবীন্দ্রনাথের এক কাহিনীর সহলিপি, বিষ্ণু দে লিখছেন, মূল রচনার অনেক বছর পরে। কবিতায় সরাসরি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস আলোচনা করছেন কখনো, কখনো অন্য কোনো কাহিনী; শুধু তাই নয়, তাকে নিজের কবিতার ভাবনার রূপক হিসেবে ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ উত্তরলিপি একটা referential text। কিন্তু বড়ো, গভীর আকারের। স্রেফ উদ্ধৃতিমূলক নয়। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে – একথা ভুল। রবীন্দ্রভাবনার প্রভাব আছে, তাও মানতে রাজি নই। রবীন্দ্রনাথের লিপিলিখনের সরাসরি উল্লেখ করে, সাহিত্যালোচনার ছদ্মবেশে রবির গল্প থেকেই বিষ্ণু তাঁর বহুমুখী কবিতার, তাঁর অন্বিষ্ট সত্তার রূপক নির্মাণ করে নিয়েছেন অসমান্তরাল, অভিনব, অগ্রণী (অর্থাৎ যাকে বুদ্ধদেব বসু avant-garde–এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন) এবং স্পষ্টতই উত্তরাধুনিক এক প্রয়াসে। তাই বিষ্ণুর কবিতার ওই অংশকে সহলিপি (উত্তরলিপি) বলা।

১৮ই জুলাই রাতে আমি যে কবিতা লিখতে শুরু করি তাও আর এক উত্তরলিপি কেননা লেখাটা বিষ্ণু দের 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' পড়তে পড়তে সেই কবিতাকে সরাসরি রেফার ক'রে, সেই অনুসন্ধিৎসার আত্মীকরণ করেই শুরু হচ্ছে। হয়তো আরো কিছুটা এগিয়ে কবিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব এক উপত্যকায় এসে উঠবে। বা কে জানে ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে কিনা, বা আদৌ সেটা পারবে কিনা। আমরা নিজের কবিতার ব্যাখ্যাতা বা বিশ্লেষক হতে পারিনা।

যাইহোক, এই রকমেরই এক উত্তরলিপি হয়তো 'ধারণালব্ধ কবিতা'। একুশ শতকের একেবারে গোড়ায় আমেরিকায় একটা কবিতা আন্দোলন চালু হয়েছে যাকে বলা হচ্ছে – Conceptual Poetry। খুব সম্প্রতি এর কথা জানতে পারলাম। এবং দেখতে পাচ্ছি যে এই

‘ধারণালব্ধ কবিতা’ আসলে এক ধরনের উত্তরলিপি। এঁরা একটা প্রকাশিত লিপিকে (যা সাহিত্য নয়) নিয়ে কাটাছেঁড়া করে তাকে সম্পূর্ণ remaster করে এক নতুন কবিতার জন্ম দিচ্ছেন। এবং একে বলছেন – Uncreative Writing। ‘ধারণালব্ধ কবিতা’ আন্দোলন গড়ে ওঠে যে মুষ্টিমেয় কবিদের ঘিরে তাদের পুরোধা কেনেথ গোল্ডস্মিথ। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবার্ট ফিটারম্যান, আমার সমসমায়িক কয়েকজন – যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেগ ডোয়ার্কিন, ভ্যানেসা প্লাস, নেডা গর্ডন, গ্যারি সালিভান, কে সিলেম মুহম্মদ, কানাডার খ্রিশ্চিয়ান বোক, জার্মান ক্যারোলিন বার্গভল প্রমুখ।

ভ্যানেসা প্লাস

রবার্ট ফিটারম্যান

ধারণালব্ধ লেখাকে এঁরা রূপকালঙ্কৃত রচনা বা allegorical writing বলতে চান। অর্থাৎ সেই ধরনের লেখা যেখানে বর্ধিত রূপকের জায়গা রয়েছে, রয়েছে সমান্তরাল উপমার ব্যবহার; ‘অ্যালেগরি’ ধাঁচের পূর্বলিপি, বা তার রচনোপযোগী পরিবেশ যেখানে তৈরি করে নেওয়া হয়। সহজভাবে বললে এমনভাবে লেখাটা গড়ে ওঠে যাতে অসংখ্য অর্থ-সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায় প্রায় একসাথে। এতে সোজাপাঠের সমস্যা স্বাভাবিক – অর্থের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া। তারপর কোনো একটা-দুটো অর্থকে অনুসরণ করতে করতে আবার একটা দিশা খুঁজে পাওয়া। এঁরা মনে করেন বস্তুবাদী কবিতার ‘বস্তু’ হলো শব্দ। শব্দই বস্তু। সেই পণ্য। কিন্তু সেই পণ্যকে গড়ে তুলতে গিয়ে যদি তার পারিপার্শ্বের সবটা, সমস্তটা দেখানো যায়, সম্ভাবনা বিরাট হয়ে শব্দ-বস্তুর যে কাঙ্খিত সীমাবদ্ধতা তাকে ছাড়িয়ে যায়। ব্যাপারটা এইরকম অনেকটা। অতি পাতি, অতি জনপ্রিয়, অতিব্যবহৃত ছিবড়ে হয়ে যাওয়া ছন্দোবদ্ধ, সাধারণ উপমায় ভরপুর এক গোলগাল সুজনবাবু মার্কা কবিতাকে নিয়ে তার রূপক, ছন্দ, অর্থের সমস্ত সম্ভাবনাগুলোকে, তার নানা বিষয়ক্ষেত্রের দিকগুলো যদি খুলে দেওয়া যায় – সেই কবিতা একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যেতে বাধ্য। এবং এটা কৌশলে করতে পারলে সেই পুনঃ-রচিত কবিতা গোটা পৃথিবীর একটা কোলাজও তৈরি করতে পারে।

রূপকালঙ্কারের সাথে প্রতীকবাদ বা symbolism এর একটা তফাৎ আছে। প্রতীকবাদী ব্যবহারে আগে আসে আইডিয়া, তাকে প্রকাশ করার প্রয়োজনেই তৈরি হয় প্রতীক। আর রূপকালঙ্কারের ক্ষেত্রে রূপকের থেকেই তৈরি হয় আইডিয়া। ধরা যাক চাঁদ। সে খাদের ধারে যখন মৃত্যুর রূপক হয়ে আসে, বা ছাদের ধারে মন খারাপের বা পিয়ামুখচন্দার – সেটা কিন্তু প্রতীকবাদী ব্যবহার। অথচ এই চাঁদের কথা ভাবতে গিয়ে যদি চাঁদের প্রচ্ছদে জমা জলের কথা, তাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার প্রস্তাবনার কথা, চাঁদের না দেখা দিকটার কথায় না-দেখা কোনো একটা মেয়ের কথা, নানা সময়ে চন্দ্রাভিযান, নভোপ্রযুক্তি, আলোর বিজ্ঞান, চাঁদের কালীদাসী বা রাবীন্দ্রিক ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের রূপকথায় চাঁদের চরিত্র ইত্যাদি ভাবনা লেখার করিডোরে

লাইন দিতে থাকে সে লেখার গোটাই আইডিয়াটাই রূপক 'চাঁদ' থেকে গড়ে উঠবে। কাজেই কনসেপচুয়াল লেখা বা ধারণালব্ধ লেখা, রূপকালঙ্কৃত লেখা। কনসেপচুয়াল পোয়েট্রির ম্যানিফেস্টোতে ভ্যানেসা প্লাস ও ফিটারম্যান সেইরকমই লিখেছেন। ওঁরা লেখেন – 'pre-textual associations assume post-textual understandings. Note that narrative may mean a story told by the allegorical writing itself, or a story told pre- or post-textually, about the writing itself or writing itself.' এইভাবে ধারণালব্ধ কবিতা এক লেখবস্তুকে গড়ে তোলে যে নিজেই নিজের কবর খুঁড়ছে। উত্তরাধুনিক সাহিত্যে যে অমরতাহীনতার কথা বলা হয়, যে জৈব নশ্বরতার কথা, যে anti-classicist প্রবণতা আমরা দেখি, এখানেও সেই স্বভাব।

সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১। নিউ ইয়র্কের জোড়াবুরুজ বিমানবোমায় ধ্বংস হলো। সেদিনকার খবর নিয়ে বেরনো পরের দিনের নিউ-ইয়র্ক টাইমস কাগজটার সম্পূর্ণ পুনর্লিখন করলেন কবি কেনেথ গোল্ডস্মিথ। সে পুনর্লিখন এক পরিশোধনবাদী ভেঙচি যেন, শব্দের জীবন্ত ত্বকের প্রতি এক অদ্বৈতবাদী বিশ্বস্ততা। যে কোনো পুনর্লিখনই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু গোল্ডস্মিথের সেই সুদীর্ঘ বই – Day – যেন একইসাথে রচনার চারণা ও ভ্রমশুদ্ধি। ওই একই কথা লিখছেন, অথচ লিখতে লিখতে তাকে বদলে তার সমালোচনা হয়ে উঠছে। ভ্যানেসা বলেন – 'Replication is a sign of desire'। একটু আগেই বললাম ধারণালব্ধ কবিতা এল ধরনের 'উত্তরলিপি'। এঁরা এই উত্তরলিপিকে দুভাবে ভাবেন। একরকমের উত্তরলিপি আছে যা পূর্বলিপির নিদর্শন হয়ে দাঁড়াতে চায়, আবার অন্য এক ধরনের উত্তরলিপি পূর্বলিপিকে প্রমাণ করার প্রয়াস করে। যেহেতু তা সম্পূর্ণরূপে কখনোই সম্ভব হয়না, ধারণালব্ধ কবিতার মূলে একটা ব্যর্থতাবোধ রয়েছে। এই আন্দোলনের নির্মাতারা তাই ভাবেন – এ একরকমের ব্যর্থ লেখা। ব্যর্থতাই উদ্দিষ্ট। সে লেখা যদি সফল হয়ে ওঠে সে ব্যর্থতার চেয়েও বড়ো ব্যর্থতা। সে লেখা ধারণালব্ধ কবিতা নয়। কনসেপচুয়াল পোয়েট্রি নয়।

**লেখসূত্রঃ**

১। বিষ্ণু দে, 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত', দেজ, ১৯৬৬।

২। Image Music Text, Roland Barthes. Tr. By Stephen Heath, Hill & Wang, New York, 1977.

৩। Notes on Conceptualism, Robert Fitterman and Vanessa Place, Ugly Duckling Presse, 2009.

== ।। ==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, অগাস্ট ২০১৪